হে মানুষ

১.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

হে মানুষ তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাতের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন কর।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة/٢١}

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।
(সুরা বাকারা-২,আয়াত -২১

* শানে নুযুল (নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল)ঃ
নবী (সঃ) এর সময়ে ইহুদী ও অমুসলিমরা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ বলে সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছিল যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যে কিতাবের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, এই কুরআন সেই কিতাব নয়। আল্লাহ পাক তাদের সেই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করবার জন্য এই সূরা নাযিল করেন। এই সুরার অধিকাংশ আয়াতই হিজরাতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবর্তীর্ণ হয়। এই সূরার আরো কিছু আয়াত মাদানী জীবনের প্রায় শেষের দিকে নাযিল হয়, যেমন- সুদ হারাম সংক্রান্ড় আয়াত। সূরা বাকারা কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ইসলামের অধিকাংশ মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বানিজ্য, জিহাদ, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের নীতি-নিয়ম বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুত্তাকীনদের বৈশিষ্ট্য, মুনাফিকদের পরিচয়, আদম ও হাওয়া (আঃ) সৃষ্টির ইতহিাস, বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত এবং তাদের নাফরমানীর কথাও বর্ণীত হয়েছে। তাছাড়া কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং সবশেষে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যান কামনার জন্য আল্লাহ পাক তার বান্দাদের এক হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের পটভূমিঃ এই সূরার ১ থেকে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী এই ঘোষনা দেয়ার পর ধারাবাহিকভাবে মুমিন-কাফির-মুনাফিকদের পরিচয়, চরিত্র ও কার্যাবলী বিস্তারিত এবং উদাহরন সহকারে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই আয়াতে উপরোক্ত তিনটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করে সার্বজনিন হেদায়াত ও আহবান জানানো হয়েছে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার জন্য । এতে যুক্তি প্রমানসহ - কেন আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে তাও মানবজাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

*আলোচ্য আয়াত ঃ এখানে **يايها الناس (ইয়া আইয়ুহান নাস)** বলে সকল মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মানব জাতি! - এর আগের আয়াতগুলোতে মুমিন, মুশরিক, কাফির, মুনাফিক ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর এখানে সকল প্রকার শ্রেণী, দল, মত, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে বুঝানোর জন্যই "নাস" ব্যবহার করা হয়েছে। **الناس** (নাস) আরবীতে মানুষ অর্থে ব্যবহার হয়। **انسان** (ইনসান) শব্দ দিয়ে একজন মানুষ বুঝানো হয় আর **الناس** (নাস) শব্দ দিয়ে সকল মানুষ, নারী-পুরুষ সকলকেই বুঝানো হয়। যে নারী-পুরুষ মানবজাতির সকল শ্রেনীর। সকল ধর্মের সকল পেশার মানুষকে আহবান করা হয়েছে اعبدو (আ'বুদু) "ইবাদাত করো" - এর উদ্দেশ্যে। ইবাদাত শব্দটি عبد (আব্দ) ধাতুর থেকে উদ্ভুত। আব্দ - ধাতুর মৌলিক অর্থ হচ্ছে কারো কর্তৃত্ব প্রাধান্য স্বীকার করে তার মুকাবিলায় আজাদী স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করা, ঔদ্ধত্য-অবাধ্যতা ত্যাগ করা, তার জন্যে অনুগত হয়ে যাওয়া। সুতরাং আব্দ শব্দ থেকে প্রাথমিক যে ধারণাটি একজন আরবের মনে উদয় হয় ; তা হচ্ছে গোলামী বন্দেগীর ধারনা। গোলামের আসল কাজ যেহেতু আপন মনিবের আনুগত্য, আদেশানুবর্তিতা। একজন গোলাম তার স্বীয় মনিবের বন্দেগী-আনুগত্যে কেবল নিজেকে সোপর্দই করেনা, বরং সর্বকাজে তার শ্রেষ্ঠত্ব - কর্তৃত্বও স্বীকার করে; তাই তার সম্মান মর্যাদায় বাড়াবাড়িও করে, বিভিন্ন উপায়ে নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রকাশ করে। এমনি করে বন্দেগীর আনুষ্ঠানিকতা পালন করে। যার অর্থ - আনুগত্য, গোলামী, পূজা। **عبدين** (আবদিয়াত) মানে, যখন গোলাম মনিবের সামনে কেবল মাথাই নত করেনা বরং তার হৃদয় মনও অবনত থাকে। তাই সংক্ষেপে "ইবাদত" এর অর্থ হচ্ছেঃ দাসত্ব করা, গোলামী করা, নির্দেশ মেনে চলা, হুকুম মানা, আনুগত্য করা, চাকরী বিধি মেনে চলা ইত্যাদি।

পরিভাষাগত অর্থেঃ- বান্দা তার মাবুদের আনুগত্যের জন্য যা কিছু করে থাকে তাই হচ্ছে ইবাদাত। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ, আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম দুনিয়াদারী, ঘরসংসার, ব্যবসা - বানিজ্য যাবতীয় বৈধ কাজই ইবাদাত। তাফসিরে রুহুল বয়ানে বলা হয়েছে। নিজের অন্তরে মাহাত্ম ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি, আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানী হতে দূরে থাকা।

ইবাদাত করতে হবে কেন?

আলোচ্য আয়াতটি পরবর্তী অংশে কেন (আল্লাহর) ইবাদাত করতে হবে এ ব্যপারে ২টি যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথমতঃ আল্লাহ আমাদের রব। বলা হয়েছে, ربكم (রাব্বিকুম) তিনি তোমাদের রব।

দ্বিতীয়তঃ তিনি আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী সকলের সৃষ্টিকর্তা। الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ রব ر- ب ب ধাতু থেকে 'রব' শব্দটি নিষ্পন্ন। যার প্রাথমিক ও মৌলিক অর্থ 'প্রতিপালন'। এরই ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে প্রাধান্য, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও প্রভুত্বের অর্থ।

এর পূর্ণ ব্যাপকতা পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, শব্দটি নিম্মোক্ত অর্থসমূহ প্রকাশ করে ঃ

(১) প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী তরবিয়ত ও ক্রমবিকাশ দাতা।
(২) যিম্মাদার, তত্বাবধায়ক, দেখাশোনা এবং অবস্থার সংশোধন - পরির্তনের দায়িত্বশীল।
(৩) যিনি কেন্দ্রীয় ভুমিকা পালন করেন, যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোক সমাবেত হয়।
(৪) নেতা-সর্দার, যার আনুগত্য করা হয়। ক্ষমতাশালী কর্তা ব্যাক্তি, যার নির্দেশ চলে, যার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়, হস্তক্ষেপ ও বল প্রয়োগের অধিকার আছে যার।
(৫) মালিক- মুনিব।

এই রব শব্দটি বুঝার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত দেখে নেয়া যায়-

فانهم عدولي الا رب العلمين- الذي خلقني فهو يهدين- والذي هو يطعمني و يسقين وإذا مرضت فهو يشفين-الشعراء-৭৭-৮০)

"বিশ্ব জাহানের রব, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, পানাহার করান, আমি পিড়িত হলে আরোগ্য দান করেন, তিনি ছাড়া তোমাদের এ সকল রব তো আমার দুশমন" (আশ শুয়ারা: ৭৭-৮০)।

এই আয়াতে দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায় এতসব গুনাবলী যার তিনিইতো আমাদের সকলের, মানবজাতীর রব। অতএব তারইতো 'ইবাদাত' আমাদের করা উচিত এবং করতেই হবে। তদুপরি তিনি আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী সকলেরই সৃষ্টিকর্তা। শুধু তাই নন, তিনি সমগ্র বিশ্বজগত এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে আমাদের জানা অজানা সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ তিনি যে শুধু সবকিছুর লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষন করেছেন তাই নয় বরং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তাও তিনি। অতএব তাকে এবং শুধু তাকেই ইবাদাত করতে হবে।" অন্য ভাবে বলা যায় তার এবং শুধু তারই ইবাদাত করতে হবে।

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমানঃ- উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা , আমাদের রব, আমদের নির্দেশ করছেন তার এবং শুধু তার ইবাদাত করতে হবে। কিন্তু কুরআন নাযিল হওয়ার সময় যেমন তেমনি বর্তমানেও কিছু কিছু মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান জানতে চায়। এসম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

তাফসিরে ইবনে কাসির- এ বর্ণনা করা হয়েছে- কোন একজন বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ "আল্লাহর যে আছে তার প্রমান কি? সে উত্তরে বলেছিলঃ "সুবহানাল্লাহ" উটের বিষ্ঠা দেখে উট আছে তার প্রমান পাওয়া যায়, পায়ের চিহ্ন দেখে পথিকের পথ চলার প্রমান পাওয়া যায়; তাহলে এই যে, বড় বড় নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশ, বহু পথ বিশিষ্ট যমীন, বড় বড় ঢেউ বিশিষ্ট সমুদ্র কি সেই মহাজ্ঞানী ও সুক্ষ্মদর্শী আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান দেয়না?

খলিফা হারুনুর রশীদ হযরত ইমাম মালিককে (রঃ) প্রশ্ন করেছিলেনঃ 'আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান কি? তিনি বলেছিলেন : "ভাষা পৃথক হওয়া, শব্দ আলাদা হওয়া, স্বর মাধুর্য পৃথক হওয়া আল্লাহ আছেন বলে সাব্যস্ত করছে।"

হযরত ইমাম আবু হানীফাকেও (র:) এইপ্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এখন অন্য চিন্তায় আছি। জনগন আমাকে বলেছে যে, একখানা বড় নৌকা আছে যার মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসার মাল রয়েছে, ওর না আছে

কোন রক্ষক বা না আছে কোন চালক। তা সত্বেও ওটা বারবার নদীতে যাতায়াত করছে এবং বড় বড় ঢেউগুলো নিজেই চিরে ফেড়ে চলে যাচ্ছে। থামার যায়গায় থামছে। চলার যায়গায় চলছে, ওতে কোন মাঝিও নেই কোন নিয়ন্ত্রকও নেই।" তখন প্রশ্নকারী বললো: আপনি কি বাজে চিন্তায় পড়ে আছেন? কোন জ্ঞানী একথা বলতে পারে যে, এতবড় নৌকা শৃংখলার সাথে তরঙ্গময় নদীতে আসছে- যাচ্ছে অথচ ওর কোন চালক নেই?" তিনি বললেন: "আফসোস তোমাদের জ্ঞানে! একটি নৌকা চালক ছাড়া শৃংখলার সঙ্গে চলতে পারেনা, কিন্তু এই সারা দুনিয়া, আসমান ও যমীনের সমুদয় জিনিস ঠিকভাবে আপন আপন কাজে লেগে রয়েছে অথচ ওর কোন মালিক, পরিচালক এবং সৃষ্টিকর্তা নেই?" উত্তর শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেল এবং সত্য জেনে নিয়ে মুসলমান হয়ে গেল।

হযরত ইমাম শাফিঈ (র:) কেও এই প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বললেন: "তুঁত গাছের একই পাতা একই স্বাদ । ওকে পোকা, মৌমাছি, গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি সবাই খেয়ে থাকে ও চরে থাকে। ওটা খেয়েই পোকা থেকে রেশম বের হয়, মৌমাছি মধু দেয়, হরিণের মধ্যে মৃগনাভি জন্মলাভ করে এবং গরু-ছাগল গোবর ও লাচ্ছি দেয়। এটা কি ঐ কথার দলীল নয় যে একই পাতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টিকারী একজন আছেন "তাকেই আমরা আল্লাহ মেনে থাকি, তিনিই আবিস্কারক এবং তিনিই শিল্পী।

হযরত ইমাম আহাম্মদ বিন হাম্বল (রঃ) নিকটেও একবার আল্লাহর অস্তিত্বের উপর দলিল চাওয়া হলে তিনি বললেন: "জেনে রাখো! এখানে একটি মজবুত দূর্গ রয়েছে। তাতে কোন দরজা নেই, কোন পথ নেই, এমনকি ছিদ্র পর্যন্ত নেই। বাহিরটা চাঁদির মত চকচক করছে এবং ভিতরটা সোনার মত জ্বলজ্বল করছে। আর উপর নীচ, ডান বাম চারদিক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। বাতাস পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনা। হঠাৎ ওর একটি প্রাচীর ভেঙ্গে পড়লো এবং ওর ভিতর হতে চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট, চলৎ শক্তি সম্পন্ন সুন্দর আকৃতির অধিকারী একটি প্রাণী বেরিয়ে এলো। আচ্ছা বলোতো এই রুদ্ধ ও নিরাপদ ঘরে এ প্রাণিটির সৃষ্টিকারী কেউ আছে কি নেই? সেই স্রষ্টার অস্তিত্ব মানবীয় অস্তিত্ব হতে উচ্চতর এবং তার ক্ষমতা অসীম কি-না? তার বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে - ডিমকে দেখ, ওর চারদিকে বদ্ধ রয়েছে, তথাপি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ওর ভিতর জীবন্ত মুরগীর বাচ্চা সৃষ্টি করেছেন। এটাই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান ।

মহান রাব্বুল আলামিন বলেনঃ

إن في خلق السموت والارض واختلاف الليل والنهار لايت لاو لي الالباب- (العمران-١٩٠)

নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে।

(সুরা-৩, আলে ইমরান-১৯০)

উপরোক্ত আয়াত এবং আল-কুরআনের আরো বহু আয়াতে বলা হয়েছে: "তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ওর উচ্চতা, প্রশস্ততা, ওর ছোট বড় উজ্জ্বল তারকারাজির প্রতি লক্ষ্য কর, ওগুলির ঔজ্জ্বল্য ও জাঁকজমক, ওদের আবর্তন ও স্থিরতা এবং ওদের প্রকাশ পাওয়া ও গোপন হওয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। রাত ও দিনের আবর্তন এবং এর সৃষ্টিকুশলতা, উপকারীতা দেখ। ঋতু বৈচিত্র্য, দিন রাতের হ্রাস বৃদ্ধি দেখ। সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ, যার ঢেউ খেলতে রয়েছে এবং পৃথিবীকে ঘিরে আছে। তারপর উঁচু নীচু পাহাড়গুলোর দিকে দেখ যা যমীনের বুকে গাড়াঁ হয়েছে এবং ওকে নড়তে দেয়না। ওদের রং ও আকৃতি বিভিন্ন। বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, আবার ক্ষেত্র ও বাগানগুলোকে সবুজ সজীবকারী ইতস্তত: প্রবাহমান সুদৃশ্য নদী গুলোর দিকে তাকাও, ক্ষেত্র ও বাগানের সবজীগুলো এবং ওদের নানা প্রকার ফল, ফুল এবং সুস্বাদু মেওয়াগুলোর কথা চিন্তা কর, মাটিও এক এবং পানিও এক, কিন্তু আকৃতি, গন্ধ, তোমাদেরকে বলে দেয়না যে, ওদের একজন কারিগর আছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "মানুষ নিজের জন্ম, বুদ্ধি, জীবন যৌবন এবং মৃত্যু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখুক। এ সমুদয় সৃষ্টিজীব কি স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তার সত্তা ও একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করে না?"

এ হচ্ছে বহু দলীলের সমষ্টি যা মহা সম্মানিত ও মহা মর্যাদাবান আল্লাহ স্বীয় সত্তাকে স্বীকার করার জন্যে প্রত্যেক চক্ষুর সামনে রেখে দিয়েছেন। যা তার ব্যাপক ক্ষমতা, পূর্ণ নৈপূন্য, অদ্বিতীয় রহমত, অতুলনীয় দান এবং অফুরন্ত অনুগ্রহের উপর সাক্ষ্য দান করার জন্য যথেষ্ঠ।

আমরা স্বীকার করছি যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, এবং রক্ষাকর্তা নেই। তিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য ও নেই এবং নিঃসন্দেহে তিনি ছাড়া সিজদার হকদারও কেউ নেই। আর হ্যাঁ, হে মানুষ! তোমরা শুনে রাখ যে, আমার আস্থা ও ভরসা তারই উপর রয়েছে, আমার কাকুতি মিনতি প্রার্থনা তারই নিকট, তারই সামনে আমার মস্তক অবনত হয়, তিনিই আমার আশ্রয় স্থল, সুতারাং আমি তারই নাম স্মরন করছি।

এই আয়াতের পরিশেষে বলা হয়েছে, যদি মানুষ তথা মানবজাতি তাদের রব, তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনে, জেনে, বুঝে তার ইবাদাত করে তাহলে তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। ইতিপূর্বে 'ইবাদাত' এবং "রবের" কিছুটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এখন 'তাকওয়া' শব্দের বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছেঃ-

*তাকওয়াঃ- لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " এর **تقو** তাকওয়া শব্দের মুল ধাতু **وقي** এর অর্থ বাঁচা। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো ভয় করা। পারিভার্ষিক অর্থ হলো:- "আল্লাহ ও তার রাসুলের সকল আদেশ মানা, নিষিদ্ধ কাজ থেকে দুরে থাকা।"
অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তার আদেশ নিষেধ মানতে হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। সকল ফরজ, ওয়াজিব পালন করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে তাকওয়া।
আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন: "তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তার নাফরমানী না করা, আল্লাহকে স্মরন করা, তাকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তার কুফরী না করা।"

তাকওয়ার ব্যপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে। কিছু লোক আছে যারা ইসলামের ফরজ ওয়াজিব এবং হারাম কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল নন, তারা বিশেষ কিছু সুন্নত ও নফল কাজ করে নিজেদেরকে মোত্তাকী এবং অন্যরা মোত্তাকী নয় বলে মনে করে। তারা হাতে তাসবীহ, মাথায় টুপি-পাগড়ী, মুখে লম্বা দাঁড়ি, গায়ে লম্বা জামা এবং পেশাব পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করাকে তাকওয়ার মাপকাঠি মনে করে। অথচ এগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাবের বেশী কিছু নয়। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক. অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অগনিত ফরজ ওয়াজিব রয়েছে যেগুলো তারা পালন করে না এবং সেগুলোর খবরও রাখেনা। যেমন পর্দাহীনতা, সুদ, ঘুষ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, দাওয়াতে দ্বীন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে তারা উদাসীন। পক্ষান্তরে, যারা এসব কাজ করেন এবং সেজন্য জান-মাল উৎসর্গ করেন তাদেরকে তারা মোত্তাকী বলতে নারাজ। অথচ সত্যিকার অর্থে তারাই মোত্তাকী। কেননা তারাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিতে জানমালের সর্বাত্নক কোরবানী করেন। তারাই বিজয়ী গাজী কিংবা শহীদ হন। তাকওয়া অর্জিত হয় বেছে বেছে শুধুমাত্র কিছু সুন্নাত ও সীমিত ফরজ কাজ আদায় করেই নয়। মোত্তাকী হতে হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক, শিক্ষা, সহ সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ জানতে হবে ও মানতে হবে ।

কিছু ভন্ড পীর-ফকির ও দরবেশ আছে যারা বহু অনৈসলামী কাজ করে নিজেদেরকে মোত্তাকী এবং আল্লাহর প্রেমিক বলে দাবী করে। তাদের হাতে তাসবীহ ও লাঠি, মুখে গাজা ও দাঁড়ি এবং পরনে বিভিন্ন ধরনের কাপড় থাকে। কবর পূজা তাদের প্রধান কাজ। এভাবে মুত্তাকী হওয়াতো দুরের কথা এসব কিছু তাকওয়া থেকে অনেক অনেক দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কেননা মুত্তাকী হওয়ার অর্থ হল আসলে, ফরজ ওয়াজিব মানা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে তারা হারাম কাজ সব করে এবং ফরজ ওয়াজিব থেকে দূরে থাকে। এসব করা আর দোজখের ইন্ধন হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় খলিফা, ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।
উবাই (রাঃ) বলেন : আপনি কি কাঁটা যুক্ত পথে চলেছেন?
ওমর (রাঃ) বলেন, 'হ্যাঁ।
উবাই (রাঃ) বলেন, কিভাবে চলেছেন?
ওমর (রাঃ) বলেন, গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সে জন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্ক ভাবে চলেছি।
উবাই (রাঃ) বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহরন।

অর্থাৎ সমাজে, জীবনে চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপ এমন সাবধানে চলা যাতে কোন পদক্ষেপই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের (স:) এর বিরোধী না হয়। এখানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের বিরোধী কাজকে পথের কাঁটা হিসাবে উদাহরন দেয়া হয়েছে। কাঁটাযুক্ত পথে যেভাবে সতর্কতার সাথে কাঁটা এড়িয়ে চলতে হয় ঠিক সেভাবেই আল্লাহ এবং তার রাসুল (সঃ) এর বিরোধী প্রতিটি কাজকর্ম প্রতি মূহুর্তে সাবধানে পরিত্যাগ করতে হবে। তাহলেই তাকওয়া অর্জিত হবে।

নিম্মোক্ত আয়াতে আল্লাহ সকল যুগের মানুষদেরকেই তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন-
و لقد وصبنا الذين اوتو الكتا من قبلكم واياكم ان التقو الله (النساء-১৩১)
"আমি তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবদের এই উপদেশ দিয়েছিলাম আর এখন তোমাদেরকেও উপদেশ দিতেছি যে, তাকওয়া অবলম্বন কর। (সুরা-৪, নিসা-১৩১)

<u>* তাকওয়ার ফায়দা কি?</u>
তাকওয়া অবলম্বনের ফলে এই দুনিয়া তথা ইহকালে ১৫ (পনের)টি ফায়দা লাভ করা যায়ঃ-

(১) তাকওয়ার ফলে মানুষের জটিল বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়।

و من يتق الله يجعله من امره يسرا (الطلاق-৪)

"আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করলে আল্লাহ বান্দার বিভিন্ন বিষয়গুলো সহজ করে দেবেন। (সুরা-৬৫, তালাক-৪)

(২) তাকওয়ার ফলে মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে ঃ

إن الذين التقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون (الاعراف ২০১)

"যারা তাকওয়া অনুসরণ করে, শয়তান তাদেরকে ক্ষতি করার জন্য স্পর্শ করলে তারা সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরন করে। তখন তারা তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। (সুরা-৭, আরাফ-২০১)

(৩) তাকওয়ার ফলে আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে যায়ঃ

ولو ان اهل القري امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الرض (الاعراف-৯৬)

"জনপদবাসীরা ঈমান ও তাকওয়ার অনুসরণ করলে, আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উম্মুক্ত করে দেব।" (সুরা-৭, আরাফ-৯৬)

(৪) হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার তাওফিক লাভ করেঃ

يايها الذين امنو ان تتقو الله يجعلكم فرقانا (الانفال-২৯)

"হে ঈমানদারগন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড দান করবেন।" (সুরা-৮, আনফার-২৯)

(৫) সংকট থেকে উদ্ধার এবং অভাবিত রিযক দান করবেন।

ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب- (الطلاق-২০)

"যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অনুসরণ করে, আল্লাহ তাকে সংকট থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে অভাবিত রিযক দান করবেন।" (সুরা-৬৫, তালাক-২০)

(৬) আল্লাহর অলী ও বন্ধু হওয়া যায়ঃ

إن او لياءه الا المتقون- (الانفال-৩৪)

" নিশ্চই মুত্তাকী ছাড়া কেহ তার বন্ধু নয়।" (সূরা আনফাল-৩৪)

(৭) আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়ঃ

فان الله يحب المتقين- (العمران-৭৬)

"আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।" (সুরা-৩, আল-ইমরান-৭৬)

(৮) আল্লাহর সাহচর্য লাভ করা যায়:

و اتقو الله واعلمو ان الله مع المتقين- (البقرة-১৯৪)

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, নিশ্চই আল্লাহর মোত্তাকীদের সাথে আছেন।"
(সুরা-২, বাকারা-১৯৪)

(৯) মোত্তাকীর আমল কবুল হয়ঃ

إنما يتقبل الله من المتقين (المائدة-৫৭)

"আল্লাহ অবশ্যই মোত্তাকীদের আমল কবুল করেন।" (সুরা-৫, মায়েদা-৫৭)

(১০) দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কোন ভয় ভীতি নেইঃ

فمن اتقي واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (الاعراف-৩৫)

"যারা তাকওয়া অর্জন করে ও নিজের আচার আচরণকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয়-ভীতি ও পেরেশানী নেই।" (সুরা-৭, আরাফ-৩৫)

(১১) গুনাহ মাফ ও বিশাল পুরস্কার দেয়া হবেঃ

و من يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا- (الطلاق-৫)

"যে আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করবেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।" (সুরা-৬৫, তালাক-৫)

(১২) তাকওয়া উত্তম সম্বলঃ-

و تزودو فان خير الزاد التقوى- (البقرة-১৯৭)

"তোমরা সম্বল সংগ্রহ কর। তবে তাকওয়াই হলো উত্তম সম্বল।" (সুরা-২, বাকারা-১৯৭)

(১৩) মোত্তাকী আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিতঃ

إن اكرمكم عند الله اتقاكم- (الحجرات-১৩)

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত যে অধিকতর তাকওয়ার অনুসারী।" (সুরা-৪৯, হুজরাহ-১৩)

(১৪) আল্লাহ মুমিন মোত্তাকীকে নাযাত দেনঃ

ونجينا الذين أمنو و كانوا يتقون - (حم السجدة-১৮)

"যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে আমরা তাদেরকে নাযাত দিয়েছি।" (সুরা-৪১, হামীম আস সেজদা-১৮)

(১৫) "তাকওয়া অবলম্বন কারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ ঃ

الذين امنو و كانوا يتقون- لهم البشرى في الحيوة الدنيا و في الاخرة- (يونس-৬৩-৬৪)

"যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে সুসংবাদ।" (সুরা-১০, ইউনুস-৬৩-৬৪)

<u>* তাকওয়া অবলম্বনের ফলে আখিরাত তথা পরকালে নিম্মোক্ত ৭টি ফায়দাঃ</u>

(১) মোত্তাকীরা বেহেশত লাভ করবে:

إن المتقين في مقام امنن- في جنت و عيون- (الدخان-৫১-৫২)

"নিশ্চই মোত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে, জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে।" (সুরা-৪৪, দুখান-৫১-৫২)

(২) মোত্তাকীদেরকে দলে দলে বেহেশতে নেয়া হবেঃ

وسيق الذين التقوا ربهم إلي الجنة زمرا- (الزمر - ৭৩)

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সুরা-৯, যুমার-৭৩)

(৩) মোত্তাকীরা আল্লাহর প্রতিনিধি দলের মর্যাদা পাবেঃ

يوم نحشر المتقين إلي الرحمن وفد- (مريم-৮৫)

"সেদিন মোত্তাকীদেরকে দয়ালু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে উঠানো হবে।" (সুরা-১৯,মরিয়ম-৮৫)

(৪) মোত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে আসমান- যমিনের সমান প্রশস্ত জান্নাতঃ

و سارعو إلي مغفرة من ربكم و جنت عرضها السموت والرض اعد للمتقين - (العمران-১৩৩)

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুতগামী হও; যার প্রশস্ততা হলো আসমান- যমিনের সমান ; এটা মোত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।"

(সুরা-৩, আল-ইমরান-১৩৩)

(৫) মোত্তাকীরা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকবেঃ

إن المتقين في جنت و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر - (القمر-৫৪-৫৫)

"মোত্তাকীরা থাকবে জান্নাত ও নহরে, সত্যের আসনে, সর্বাধিপতি শাহানশাহের সান্নিধ্যে।"

(সুরা-৫৪, কামার-৫৪-৫৫)

(৬) আল্লাহ মোত্তাকীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।

ثم ننجي الذين التقوا و نذر الظالمين فيها جثيا- مريم-৭২)

"অতঃপর আমি মোত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখান থেকে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।" (সুরা-১৯, মরিয়ম-৭২)

(৭) মোত্তাকীদের ছাড়া কেয়ামতের দিন অন্য সকল বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবেঃ

الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين- (الزخرف-৬৭)

"মোত্তাকীদের ছাড়া ঐ দিন সকল বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে।" (সুরা-৩৩, যুখরুফ-৬৭)

এ হলো তাকওয়ার কিছু উপকারীতা ও ফায়দা। যেগুলো নগদ এই দুনিয়াতে এবং পরকালে পাওয়া যাবে। কুরআন এবং হাদিছে তাকওয়ার আরো বহু পুরস্কারের কথা উল্লেখ আছে। তাই সবারই তাকওয়া অর্জনে আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেনঃ-

واتقو الله حق تقاته- (العمران- ১০২)

"তোমরা আল্লাহকে তাকওয়ার যথার্থ দাবী পূরন করে ভয় করো।" (সূরা-৩, আল ইমরান-১০২)।

অতএব আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের রব মহান আল্লাহকে যথাযথ ভাবে জানব, বুঝব, এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তার যথাযথ ইবাদাত করব। আল্লাহ মানবজাতিকে সেই তাওফিক দান করুন, আমিন।

২.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

হে মানুষ হালাল খাও। শয়তানের অনুগামী হয়োনা।

يايها الناس كلو مما في الرض حلا طيبا- ولا تتبعو خطوت الشيطن- انه لكم عدو مبين- (البقرة- ১৬৮)

"হে মানুষ! যমীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি রয়েছে তা খাও এবং শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলো না; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(সূরা-২, বাকারা-১৬৮)

*<u>শানে নুযুল (নাযিল হওয়ার সময় প্রেক্ষাপট)</u>ঃ-

পূববর্তী আয়াতে দেখুন।

* <u>আলোচ্য আয়াতের পটভূমিঃ-</u> আমরা জানি যে সূরা বাকারা কুরআন শরীফের দীর্ঘতম সূরা। এবং এতে ইসলামের যাবতীয় মৌলিক বিধিবিধান সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতের পূর্বের কয়েকটি আয়াতে তাওহীদ বা একত্ববাদের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করার পর শিরকের অসারতা তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর এই আয়াতে

শিরক থেকে চুড়ান্ত মুক্তির জন্য মানুষের হালাল হারামের বিধান বর্ণনা করার মাধ্যমে অন্তর থেকে শিরকের মূলোৎপাটন করে শিরকের চিহ্ন নির্মূল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহপাক একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহতায়ালা একাই সর্মসময় কর্তা ও সবশক্তিমান আর যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানায় তারা এ অপরাধ জনক কাজের জন্য বদলা স্বরূপ যে শাস্তি পাওয়া উচিত তা অবশ্যই পাবে। তারপর তিনি পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে তার বান্দার রিযিক (জীবন সামগ্রী) দানকারীও একমাত্র তিনিই এবং তিনিই হালাল - হারামের নির্ধারনকারী।

আলোচ্য আয়াতঃ এখানে কোরআন মজীদ মানুষকে জীবনের পবিত্র জিনিসগুলো ভোগ ব্যবহার করার আহবান জানাচ্ছে এবং যাবতীয় মন্দ জিনিষ থেকে দুরে থাকতে ও শয়তানের অনুসরণ থেকে দুরে থাকার জন্য সতর্ক করছে। কারণ শয়তান তাদেরকে বারবার মন্দ ও ক্ষতিকর জিনিসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। হালাল হারামের পার্থক্য না করে যথেচ্ছা ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে ওরা অনবরত প্ররোচনা দিয়ে চলছে। এইভাবে সে মানুষকে সরাসরি আল্লাহর না-ফরমানি করতে চায়।
এপর্যায়ে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে যা কিছু ভালো জিনিস সৃষ্টি করেছেন সবই মানুষের জন্য হালাল করেছেন, শুধু মাত্র সেইগুলো বাদে যেগুলো নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।
এই সূরার ১৭৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

إنما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير وما اهل به لغير الله ۚ فمن اضطر عير باغ و الاعاد فلا اثم عليه- إن الله غفور الرحيم- (بكرة-١٧٣)

"অবশ্যই তিনি মৃত (জন্তুর গোস্ত), সবধরণের রক্ত ও শুকরের গোস্তকে হারাম করেছেন এবং (এমন সব জন্তুও হারাম করেছেন) যা আল্লাহতায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে। (তবে সে ব্যাক্তির কথা আলাদা) যাকে (এজন্যে) বাধ্য করা হয়েছে যদি সে ব্যক্তি এমন হয় যে, সে (আল্লাহর আইনের) সীমালঙ্গনকারী হয়না, অথবা (যে টুকু হলে জীবনটা বাঁচে তার চাইতে বেশী ভোগ করে) তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না তাহলে (এই অপারগতার সময়ে হারাম খেলে) তার উপর কোন গুনাহ নেই। অবশ্যই আল্লাহতায়ালা ক্ষমাশীল, তিনি অনেক মেহেরবান। (বাকারা:১৭৩)

কি কারনে হালাল বা হারাম করা হয়েছে তাও জানানো হয়েছে। তার নির্দেশও জানানো হয়েছে যে, এসব বিষয়ে কেউ যেন শয়তানের অনুসরণ না করে। কারন সে তাদের স্পষ্ট দুশমন । সে কখনো তাদেরকে ভালো জিনিসের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে না। চিন্তা ও কাজের মাধ্যমে সদা- সর্বদা খারাপ কাজের দিকে এগিয়ে দেয়াই তার কাজ। এজন্যে হালাল- হারাম তার নিজের পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হওয়া দরকার বলে সে বুঝায়, এ ব্যাপারে আল্লাহর বিধান কি আছে তার পরওয়া করার কোন প্রয়োজন নেই বলে ওয়াসওয়াসা দেয়। এ বিষয়ে তারা ইহুদীদের অনুসরণে বাস্তব কাজে নিজেদের সিদ্ধান্তকেই আল্লাহর শরীয়াত মনে করে, মক্কার কুরাইশরাও এই দাবীই করতো।

পৃথিবীর হালাল ও বৈধ জিনিষ সম্পর্কে এই আয়াতটিই চুড়ান্ত নির্দেশ। তবে খুব সামান্য কিছু বিষয় সম্পর্কেই কোরআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে আকীদা বিশ্বাস গ্রহন করা এবং সৃষ্টিজাত ও মানব প্রকৃতির দাবী পূরণ করার ব্যাপারে ইসলামে কত বেশী প্রশস্ততা রয়েছে। অতএব বুঝা গেল আল্লাহতায়ালা যা কিছু পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তা সবই মানুষের জন্য আর তাই বিশেষ কিছু জিনিস ছাড়া বাকি সকল জিনিসই মানুষের জন্য বৈধ ঘোষনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যেন তারা কোন ব্যাপারেই ভারসাম্য না হারায় এবং মধপন্থা ত্যাগ না করে। সাধারণ ভাবে জীবনের সকল পবিত্র জিনিসের ভোগ ব্যবহারের স্বাধীনতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং প্রকৃতির চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে তাদের কোন সংকোচ, সংকীর্ণতা আমরা মনকে কঠিন করার কোন প্রয়োজন নেই।

আল্লাহতায়ালা মানুষের কাছে শুধু এটুকুই চান যে, তারা জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভোগ ব্যবহার সম্পর্কে একমাত্র তারই হালাল-হারাম বিধান মেনে চলুক। যে শয়তান তার প্রকাশ্য দুশমন, কখনও যেন তার ধোঁকায় পড়ে কোনো অন্যায় ও অবৈধ কাজে সে জড়িত হয়ে না পড়ে। শয়তান কোনো অবস্থাতেই মানুষের কল্যাণ চায়না। তার যা কিছু নির্দেশ বা উস্কানী, তা সবই মানুষের অমংগল অন্যায় ও নির্লজ্জ কাজের জন্যে হয়ে থাকে। শয়তানের আর একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে গোমরাহ করা, তাদেরকে আল্লাহর বিরোধী বানানোর চেষ্টা করা। যদিও এসব বিষয়ে সে মুমিনের মধ্যে দৃঢ় ও স্থায়ী বিশ্বাস পয়দা করতে পারেনা।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণীত হালাল- হারাম সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক-
রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে এই আয়াতটি পঠিত হলে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) দাড়িয়ে বললেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা আমার প্রার্থনা কবুল করেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন: হে সা'দ, পবিত্র জিনিস এবং হালাল গ্রাস ভক্ষণ কর, তা হলেই আল্লাহপাক তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মদ-এর প্রান রয়েছে তার শপথ! যে হারাম গ্রাস মানুষ তার পেটের ভিতরে নিক্ষেপ করে, ওরই কুফল স্বরুপ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন ইবাদাত গৃহীত হয়না। হারাম আহার্যের দ্বারা শরীরের যে গোশত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তা দোযখী । (ইবনে কাসীর)

ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرامو ماسكت عنه فهو عفو ۔ فاقبلومن الله عفيتة فان الله لم يكن لينسى شيئا و تلا-
আল্লাহ তার কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নিরবতা অবলম্বন করেছেন। তাতে ক্ষমা রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে তার ক্ষমা গ্রহণ কর কেননা আল্লাহ তো কোন কিছ ভুলে যান না-ভুল বশত বলেননি এমন তো হতে পারে না।
এ কথার প্রমান হিসেবে তিনি পাঠ করলেন; (مريم-৬৪) وما كان ربك نسيا- "তোমাদের প্রভু ভুলে যান না।" (সুরা মরিয়াম, আয়াত-৬৪)

আল্লাহতায়ালা কতগুলো কাজকে ফরজ করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তা নষ্ট করে ফেল না । তিনি কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তোমরা সে সীমা লংঘন করো না। কিছু কিছু জিনিসকে তিনি হারাম করেছেন, তোমরা তার বিরোধীতা করোনা । আর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশত -না ভুলে গিয়ে অনেক বিষয়ে তিনি পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করেছেন। আবার সে বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা। -(তিরমিজী, ইবনে মাজাহ)

হালাল সুপষ্ট, হারামও সুপষ্ট । এ দুটির মাঝখানে কতিপয় জিনিস সন্দেহ পূর্ণ। সে সব সম্পর্কে অনেক লোকেরই জানা নেই যে, আসলে তা হালাল না হারাম। এরুপ অবস্থায় যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন ও স্বীয় মান মর্যাদা রক্ষার জন্যে সেসব থেকে দূরে থাকে, সে নিশ্চয়ই নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তম্মধ্য থেকে কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়বে, তার পক্ষে হারামের মধ্যে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নিজের জন্তুগুলোকে নিষিদ্ধ চারণভুমির আশে পাশে চরায়, তার পক্ষে সে নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তোমরা শোন, প্রত্যেক রাজা-বাদশাহরই একটি সুরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আরও শোন আল্লাহর হারাম করা জিনিসগুলোই তার সংরক্ষিত চারণভূমি।
(বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী)

*অতএব আমরা আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত ও রাসূল (সঃ) নির্দেশিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে মেনে চলব। সন্দেহ পূর্ণ বিষয়গুলো এড়িয়ে চলব। (এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে 'ইসলামে হালাল - হারামের বিধান ' আল্লামা ইউসুফ আল- কারযাভী বইটি অধ্যয়ন করুন) ।

৩.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

"হে (মানুষ) বুদ্ধিমানেরা ! কিসাসের (সাম্যের) আইন মেনে চল।"

ولكم في القصاص حيوة يالي الالباب لعلكم تتقون ۔ (بكرة-১৭৯)

হে বুদ্ধিমানেরা (মানুষ) এই কিসাস (সাম্যের আইন) এর মাঝেই তোমাদের (সমাজ ও জাতির) জীবন আছে, আশা করা যায় তোমরা সতর্ক হয়ে চলবে।
(বাকারা-১৭৯)

<u>* শানে নুযুলঃ (নাযিল হওয়ার সময় ও প্রেক্ষাপট)</u>
ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

*আলোচ্য আয়াতের পটভূমিঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইসলামী আইনের একটি মৌলিক ধারা "কিসাস" এর বিধান বর্ণীত হয়েছে। পরিবেশ , পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনটি "অপশন" বা সুযোগ রয়েছে।
হত্যার পরিবর্তেঃ (১) হত্যা, (২) বিনিময় (৩) ক্ষমা, অতঃপর এখানে এই বিধানের যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য স্পষ্ঠ করে তুলে ধরা হয়েছে। এর তাৎপর্য বুঝার ব্যাপারে মানুষের বুদ্ধি প্রজ্ঞা ও গবেষনাকে কাজে লাগানোর জন্য এই আয়াতের মাধ্যমে প্রেরণা জাগানো হয়েছে। একইভাবে জাগানো হয়েছে তাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহভীতির চেতনা এবং বলা হয়েছে "কিসাস" এর এই আইন বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে সমাজের শান্তি, শৃংখলা, স্থিতি।
আলোচ্য আয়াতঃ **القصاص** "কিসাসুন" শব্দের অর্থ সমপরিমান বা অনুরুপ। অর্থাৎ যতটুকু জুলুম করা হয়েছে তার সমপরিমান বদলা নেয়া তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েয নয়। এই সূরারই ১৯৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে-
فمن اعتدای علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم ۔واتقواالله و اعلمو ان الله مع المتقین- (بکرة-১৯৪)
"যদি কেহ তোমাদের উপর হস্ত প্রসারিত করে তোমরাও তেমনি তাদের উপর হস্ত প্রসারিত কর। অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং এই কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের সংগেই রয়েছেন যারা তার নির্দিষ্ট সীমা লংঘন হতে দূরে সরে থাকে। (আল-বাকারা-২, আয়াত-১৯৪)

وإن عاقبتم فعاقبو بمثل ماعؤقبتم به- ولئن صبرتم لهو خير للصبرین (نحل-১৬:১২৬)
"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহন কর তবে ঐ পরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যে পরিমান তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম ।" (সূরা লাইল আয়াত-১৬ঃ১২৬)।

শরিয়তের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমানের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, যেভাবে ও যে পন্থায় নিহত ব্যাক্তিকে হত্যা করা হয়েছে ঠিক সেভাবে ও সে পন্থায় তাকে হত্যা করতে হবে। বরং এই কথার অর্থ এই যে নিহত ব্যক্তির প্রাণ সংহারের যে কাজ হত্যাকারী করেছে তার সাথেও সেই কাজটি করতে হবে অর্থাৎ তাকেও হত্যা করতে হবে।

আসলে আয়াতে বর্ণিত কেসাস দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কেসাস নেয়া হয় তা নয়, বা এটা প্রজ্জলিত প্রতিশোধ স্পৃহা নির্বাপক কোন বিধানও নয়, বরং এটা তার চেয়ে অনেক উন্নত ও উচুঁ পর্যায়ের এক পদক্ষেপ, যার দ্বারা নিরাপত্তা বিধান হয়। বহু জীবন সংরক্ষণের জন্যই এই বিধান, আরও স্পষ্ঠ করে বলা যায়, এ কাজটি নিজেই যেন এক জীবন সংরক্ষন প্রক্রিয়া। তারপর এ বিষয়টি বুঝার জন্য এর উপর চিন্তাভাবনা করার জন্য এবং এই কিয়াস ফরজ হওয়ার তাৎপর্য বুঝার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। আহবান জানানো হয়েছে অন্তরসমূহকে উজ্জীবিত করা এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহ ভীতি সঞ্চার করার জন্যে। এই আয়াতটিতে বর্তমান বিশ্বে এবং জাহেলী যুগে প্রচলিত দুই চরম পন্থার প্রতিশোধ গ্রহনের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন। জাহেলী যুগে যেমন তেমনি বর্তমান যুগে তথাকথিত সম্মানী গোত্র বা জাতির এক ব্যক্তির হত্যার বদলা শত শত ব্যক্তির হত্যার মাধ্যমে নেওয়া হয়। যেমন আমেরিকান বা বৃটিশ একজন সৈন্যের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হয় হাজার হাজার সাধারন সৈন্য হত্যার মাধ্যমে, কিংবা গোটা দেশ বা জাতি ধংসের মাধ্যমে। যেমন ইরাক বা আফগানিস্তানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। অতীতে যা আরব জাহিলিয়াতে ছিল, নিকট অতীতে তা আমরা জাপানে এটম বোমার ব্যবহারের মাধ্যমে দেখতে পাই। ইসলাম এই প্রথা রহিত করে দিয়ে শুধুমাত্র দোষী ব্যাক্তিকে হত্যার মাধ্যমে শাস্তি দেয়ার বিধান করেছে। অপর চরমপন্থা হচ্ছে হত্যার শাস্তি মৃত্যদন্ড রহিত করে দেয়া। তথাকথিত মানবতাবাদী সংগঠন মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে এমন প্রকারে অপপ্রচার চালিয়েছে যে, বহুলোক ইহাকে একটি ঘৃন্য ও বীভৎস কাজ বলে মনে করতে শুরু করেছে।

এটা কোন এক ব্যক্তির জীবন রক্ষাই নয়, নয় এটা কোন পরিবার বা দলের জীবন রক্ষা, বরং এটা বিশ্বজোড়া মানব পরিবারেরই জীবন রক্ষা। এরপর জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম এই শাস্তি দানের বিধান চালু করে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর যে জিনিসটি প্রবর্তন করেছে, তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতিটি বিধানের মধ্যে যে গভীর প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা বুঝার জন্য প্রয়োজন মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করা এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহ ভীতি পয়দা করা।
অতএব, আমরা ইসলামের প্রতিটি বিধান সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করে এগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করব। এতেই রয়েছে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

<u>হে মানুষ ! তোমার ‘রব’ কে ভয় কর এবং ‘মা’ কে সম্মান কর।</u>

يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء- واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا- (النساء- ١)

হে মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যাক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, এবং তাদের দুজনার থেকে বহু সংখ্যক নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেই আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবী করো এবং গর্ভ (ধারিনী মা) কে সম্মান করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছেন।

(সূরা- নিসা(৪), আয়াত-১)

<u>* শানে নুযুল (নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল)ঃ</u>

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)ও এটাই বলেন। তাফসীরে ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণীত আছে যে, এ সূরায় এমন ৮টি আয়াত রয়েছে যেগুলো এ উম্মতের জন্য প্রত্যেক ঐ জিনিস হতে উত্তম যার মধ্যে সূর্য উদিত হয় ও অস্তমিত হয়। প্রথমটি হচেছঃ ‘আল্লাহর স্বীয় আহকাম তোমাদের উপর পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করতে চান এবং তোমাদেরকে ঐ সৎ লোকদের পূর্বে অতীত হয়েছে ও তোমাদের তওবা কবুল করতে চান, আল্লাহ মহাজ্ঞাতা বিজ্ঞানময়।

দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছেঃ “আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুনা বর্ষন করতে এবং তোমাদের তওবা কবুল করতে চান, আর স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারীরা চায় যে, তোমরা সত্য পথ হতে বহুদূরে সরে পড়ে।”

৩য় আয়াতটি হচ্ছেঃ মানুষকে যেহেতু দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই আল্লাহ তোমাদের হালকা করতে চান।”

৪র্থ আয়াত হচ্ছেঃ “আল্লাহতায়ালা কারো উপর অনু পরিমানও অত্যাচার করেন না। যার যে পুন্য থাকে তার প্রতিদানে তিনি তাকে বেশী বেশী করে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে পূরস্কার হিসেবে যে বড় প্রতিদান দেবেন তা তো পৃথক।”

৫ম আয়াতঃ “তোমরা যদি বড় বড় পাপ সমূহ হতে বেঁচে থাক তবে ছোট ছোট পাপগুলো তিনি নিজেই ক্ষমা করে দেবেন এবং অবশিষ্ট পাপীদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন।”

৭ম আয়াতঃ ঐ লোকগুলো যদি নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট এসে যেত এবং নিজেও স্বীয় পাপের জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো ও রাসূল (সঃ) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পেতো।

৮ম আয়াতঃ কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হল অতঃপর সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালাকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে।

এ সূরাটি সম্ভবত তৃতীয় থেকে পঞ্চম হিজরীর সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন সময় এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়।

যেমন উত্তরাধিকার বন্টন ও এতিমের অধিকার সম্বলিত বিধানসমূহ ওহোদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। তখন সত্তুর জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনাটির ফলে ছোট জনবসতির বিভিন্ন গৃহে শহীদদের মিরাস কিভাবে বন্টন করা হবে এবং তারা যেসব এতিম ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তাদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষন করা হবে এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই অনুমান করা যায়, প্রথম ৪টি রুকু এবং পঞ্চম রুকুর ১ম তিনটি আয়াত এসময়ে নাযিল হয়ে থাকবে।

মাতুর রিকার যুদ্ধে ভয়ের নামাজ (যুদ্ধ চলা অবস্থায় নামাজ পড়া) পড়ার রেওয়াত আমরা হাদীসে পাই। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাই এখানে অনুমান করা যেতে পারে, যে ভাষনে (১৫ রুকু) এ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি তার কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে।

৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে বনী নাযিরকে বহিস্কার করা হয়। তাই সে ভাষনটিতে ইহুদীদেরকে এমর্মে সর্বশেষ সতর্ক বাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আমি তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেয়ার আগে ঈমান আনো" সেটি এর পূর্বে কোন নিকটতম সময়ে নাযিল হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

বনীলে মোত্তালিক যুদ্ধের সময় পানি না পাওয়ার কারনে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছিল । আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই যে ভাষনটিতে (৭ম রুকু) তায়াম্মুমের বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে সেটি এসময়ই নাযিল হয়েছিল বলে মনে করা যায়।

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মান এবং বাস্তবে এ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অবস্থায় যে সব নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সূরা বাকারায় সেগুলো প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সমাজ আগের চাইতে বেশী সম্প্রসারিত হয়েছিল। কাজেই এখানে আরো নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সূরা নিসার এ ভাষনগুলোতে মুসলমানরা কিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জীবন ধারার সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে পারে তা আরো বিস্তারিত বর্ননা করা হয়েছে। এখানে পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়েকে বিধি নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। এতিমের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম- কানুন নির্ধারিত আওতাধীন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধ দন্ডবিধির ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। মদপানের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাহারাত পাক পবিত্রতা অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার সাথে একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের কর্মধারা কেমন হতে পারে, তা মুসলমানদের জানানো হয়েছে। আহলি কিতাবদের নৈতিক, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষন করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাংক অনুসরণ করে চলা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকদের কর্মনীতির সমালাচনা করে যথার্থ ও খাটি ঈমানদারীর এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য সূচক চেহারা পুরোপুরি উম্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে যে সংঘাত চলছিল ওহুদ যুদ্ধের পর তা আরো নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ওহোদ যুদ্ধের বিপর্যয়ে আশে পাশের মুশরিক গোত্রসমূহ ইহুদী প্রতিবেশী ও মোনাফিকদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলমানরা সবদিক থেকে বিপদের মধে জড়িয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে আবেগময় ভাষনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। মদীনায় মুনাফিক ও দূর্বল ঈমানদার লোকেরা সব রকমের ভীতি ও আশংকার খবর ছড়িয়ে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এধরনের খবর দায়িত্বশীলদের কাছে পৌছিয়ে দেবার এবং কোন খবর সম্পর্কে পুরোপুরি অনুসন্ধান না করার আগে তা প্রচার করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নির্দেশ দেয়া হয়।

তখন এমন একটা সময় ছিল, মুসলমানদের বারবার যুদ্ধ ও নৈশ অভিযানে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় তাদের এমন সব পথ অতিক্রম করতে হতো যেখানে পানির চিহ্ন মাত্র পাওয়া যেত না। সেক্ষেত্রে পানি পাওয়া না গেলে ওযু ও গোসল দুয়ের জন্য তাদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়া এ অবস্থায় সেখানে নামাজ সংক্ষেপ করারও অনুমতি দেয়া হয়। আর সেখানে বিপদ মাথার উপর সবসময় চেপে থাকে সেখানে সালাতুল খাওফ (ভয়কালীন নামাজ) পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যে সব মুসলমান কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক সময় যুদ্ধের কবলেও পড়ে যেত, তাদের ব্যাপার ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বেশী পেরেশানির কারণ। এব্যপারে একদিকে ইসলামী দলকে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐ মুসলমানদেরকেও সবদিক থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ করে বনী নাযিরের মনোভাব ও কর্মধারা অত্যন্ত বিরোধমূলক ও ক্ষতিকর হয়ে দাড়ায়। তারা চুক্তি ভঙ্গ করে খোলাখুলি ইসলামের শত্রুদের সাথে সহযোগীতা করতে থাকে এবং মদীনায় মুহাম্মদ (সঃ) ও তার দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকে। তাদের এসব কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয়

এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে সর্বশেষ সতর্কবানী শুনিয়ে দেয়া হয়। এরপরই মদীনা থেকে তাদের বহিস্কার করা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন কর্মধারা অবলম্বন করে। কোন ধরনের মুনাফিকদের সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করা হবে, এ সম্পর্কে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা মুসলমানদেরে পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। তাই এদের্ সবাইকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর মুনাফিকদের সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে।
চুক্তিবদ্ধ নিরপেক্ষ গোত্র সমূহের সাথে মুসলমানদের কোন ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের নিজেদের চারিত্রিক ত্রুটি মুক্ত করাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয়। কারণ এ সংঘাত সংঘর্ষ এ ক্ষুদ্র দলটি একমাত্র নিজের উন্নত নৈতিক চরিত্রের বলেই জয়লাভ করতে সক্ষম ছিল। এছাড়া তার জন্য জয়লাভের আর কোন উপায় ছিলনা। তাই মুসলমানদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যে কোন দূর্বলতা দেখা দিলে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করা হয়েছে। ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের দিকটিও এ সূরায় বাদ যায়নি। জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় ইসলাম দুনিয়াকে যে নৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংশোধনের দিকের আহবান জানিয়ে আসছিল, তার বিস্তারিত উপস্থাপনের সাথে সাথে এ সূরায় ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুশরিক এ তিনটি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারনা, বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, নীতি ও কর্মকান্ডের সমালোচনা করে তাদের সামনে একমাত্র সত্য দীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

* আলোচ্য আয়াতের পটভূমিঃ-

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। এটি মানবজাতীকে এক প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার বন্দেগী নির্দেশ করে, একইভাবে তা নির্দেশ করে তাদের এক মূল ও এক পরিবারের দিকে। 'প্রাণকে' এখানে মানবতার ঐক্যের বিন্দু এবং 'পরিবারকে' গোটা সমাজের ঐক্যের সূত্র হিসেবে নির্ধারন করা হয়েছে। যা মানব অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং আত্নীয়তার বন্ধন ও পারস্পারিক সম্প্রীতি অটুট রাখার মানসিকতাও সৃষ্টি করে। এই ভিত্তিমূলের উপর গোটা মানবতার মাঝে পারস্পারিক দয়া, করুনা এবং সংহতির যাবতীয় দায়ভার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং সে মোতাবেক সকল প্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

এই সূরার প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত বিধি-বিধান ও দায়ভারের মধ্য থেকে সারা পরিবারের মধ্যে দুর্বল অর্থাৎ যা কিছু এতীমের সাথে সম্পৃক্ত তা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এতিমদের সম্পদের প্রতি যত্নবান হওয়ার পদ্ধতির সাথে সাথে, একই পরিবারের সদস্যদের মাঝে উত্তরাধিকার পদ্ধতি এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্তরের আত্নীয়-স্বজনের অংশ সুনিশ্চিত করে। এ সমস্ত বিধি- বিধান এসেছে এক বুনিয়াদি সূত্র থেকে যা সূরার প্রথম আয়াতে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। এ বুনিয়াদের কিছু কথা আয়াতের শুরুতে কিছু কথা মাঝখানে আবার কিছু কথা শেষে স্মরন করিয়ে দেয়া হয়েছে।
সেই বুনিয়াদটি হচ্ছে প্রভূত্ব একমাত্র তারই আইন বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি রচনা করার অধিকারও তার। এই অধিকার থেকেই প্রত্যেক বিধান ও নিয়মের উৎপত্তি হয়।

আলোচ্য আয়াতঃ-

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একপ্রাণ থেকে..... নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তোমাদের ব্যপারে সচেতন রয়েছেন।
এই আয়াত তাকওয়ার গুনের সাথে গুনান্বিত একটি মানব গোষ্টিকে সম্বোধন করা হয়েছে, এটা এজন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যিনি তাদেরকে মাত্র একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের দু'জন থেকে তাদের বংশবিস্তার করেছেন।
এর সাধারণ মমার্থগুলো আসলে অনেক বড়, গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি মানুষেরা তাদের কান ও অন্তরকে সেদিকে নিবদ্ধ করতো, তাহলে তাদের এ প্রচেষ্টা তাদের জীবনে বিরাট একটা পরিবর্তন সাধন করতে পারতো, তাদেরকে নানাবিধ জাহেলিয়াত থেকে ঈমান, সৎপথ, তথা তাদের সভ্যতার দিকে স্থানান্তরিত করতে পারতো।
এই মর্মার্থগুলো মানুষের অন্তর ও চোখের সামনে নানা ধরনের চিন্তা গবেষনার প্রশস্ত ক্ষেত্র উম্মোচন করেঃ-
১। সেই মূল তথ্য সমূহের একটি এই যে, মানবজাতি তার সৃষ্টির উৎসকে স্মরন করবে, যিনি তাদেরকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। যারা এই নিগুঢ় তথ্যকে ভুলে যায় তারা মূলত পৃথিবীর সব কিছুকেই ভুলে যায়। তারপর তাদের জন্য আর কোন বিষয়ই অটুট থাকে না ।
অবশ্যই মানুষ সম্পুর্ণ অস্তিত্ববিহীনতা থেকে অস্তিত্বে এসেছে। কে তাদের এখানে আনলো? নিশ্চয়ই তারা স্বেচ্ছায় এখানে আসেনি। কারণ, পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাদের অস্তিত্বই ছিলনা। সুতরাং তাদের ইচ্ছার বাহিরে অন্য একটি ইচ্ছা শক্তি

তাদেরকে এ পৃথিবীতে এনেছে। তাদের সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করেছে। তাদের জন্য এখানে আসার রাস্তা তৈরী করেছে। তাদের জীবন চলার পথ বাছাই করেছে। তাদেরকে তাদের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ দান করেছে। তাদেরকে এর প্রস্তুতি ও যোগ্যতা দান করেছে। এবং তাদেরকে এ সৃষ্টিজগতের সাথে আচরণ করার ক্ষমতা দান করেছে। তাদেরকে তাদের উপলব্ধি ব্যতিরকেই দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। এটা আল্লাহর ইচ্ছা তিনি যা চান তাই করতে পারেন।

যদি মানবজাতি এ বাস্তবতাকে স্মরন করতো যার থেকে তারা প্রায়শই অন্যমনস্ক থাকে তাহলে তারা শুরুতেই সঠিক পথের দিকে ফিরে আসতে পারতো। নিঃসন্দেহে এই ইচ্ছা যা তাদেরকে এক সময় এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে, তাই এখানে তাদের জীবন চলার পথ অংকন করে দিয়েছে এবং পৃথিবীতে বসবাস করার সব ক্ষমতা তাকে দান করেছে। সেই ইচ্ছাই তাদেরকে সমস্ত জিনিসের অধিপতি বানায়, তাদেরকে সকল বস্তুর সাথে পরিচিত করায়। তাদের যাবতীয় কাজ ভালোভাবে আঞ্জাম দেয় এবং একমাত্র তারই অধিকার রয়েছে যে, তিনি তাদের জীবনের উৎস অংকন করবেন। তাদের নিয়ম পদ্ধতি ও বিধি- বিধান রচনা করবেন। এবং তাদের জন্য মূল্যবোধ ও মাপ কাঠি নির্ধারণ করবেন। কোনো ব্যপারে মত - দ্বৈততা ও মতবিরোধ দেখা দিলে মানুষ তার বিধান, আদর্শ মূল্যবোধ ও মাপকাঠির দিকেই ফিরে আসে। সুতারাং তারা একমাত্র সে বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে যা মহান রাব্বুল আলামিন তাদের জন্যে বাছাই করেছেন।

২। এই বাস্তব সত্যটি এদিকে ইংগিত করে যে, এ মানবকুলের উৎপত্তি একটি মাত্র ইচ্ছা থেকেই হয়েছে, তাই মানুষের সবাই একই আত্নীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ একই মূল থেকে এদের একই বংশের সাথে এরা সম্পৃক্ত।
"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন.... অগনিত পুরুষ ও নারী।"
মানবজাতি যদি এ মৌলিক সত্য কথাটি স্মরন করতো, তাহলে তাদের যাবতীয় বৈষম্য ও মতপার্থক্য শেষ হয়ে যেতো। এটাই পরবর্তী মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয়েছে এবং তা একই উৎসের এই সন্তানদের পৃথক করে দিয়েছে, আত্নীয়তার সকল বন্ধনকেও ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে। এ সত্য বিষয়টির উপস্থিতিই মানুষের মধ্যে বৈষম্য দুরীকরনের জন্য যথেষ্ট। এর তিক্ত স্বাদ মানবজাতি ইতিমধ্যে ভালো করেই আস্বাদন করেছে। আজো অত্যাধুনিক জাহিলিয়াতের যুগে তারা এই স্বাদ গ্রহণ করে চলেছে। যে জাহিলিয়াত রং, বর্ণ ও জাতিতে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং তার অস্তিত্বকে এ বৈষম্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। তা জাতি সম্প্রদায় এবং গোত্রের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু এক মানবতা ও এক প্রভূত্বের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এ বাস্তব সত্যটির প্রতিষ্ঠা, স্থিতিশীলতা, শ্রেণীগত দাসত্ব- যা বর্তমানে ভারতে বিদ্যমান রয়েছে ও যার কারনে সমাজতান্ত্রিক দেশ গুলোতেও রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে- তা দূর করার জন্যে যথেষ্ট হতো। সেই দাসত্ব ও বৈষম্যকে আধুনিক জাহিলিয়াত তার ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তি মনে করে। যার থেকে এমনিই সকল মানুষের উৎপত্তি, সে এক প্রভুর দিকে আমরা ফিরে যাবো- তাকে ভুলে যায়।
৩। আরেকটি সত্য যারদিকে সবাই লক্ষ করা উচিত তা হচ্ছে আল্লাহতায়ালা একই প্রাণ থেকে তার সংগিনিকে সৃষ্টি করেছেন এই বাস্তব সত্যটি যদি মানবজাতি উপলব্দি করতো তাহলে আজ যে বেদনাদায়ক ভুল ভ্রান্তির মাঝে মানব সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে তার সামনে সঠিক কথা পরিবেশন করার জন্য এটাই যথেষ্ট হতো। তারা আজ নারী জাতি সম্পর্কে নানাপ্রকার ঘৃন্য চিন্তাভাবনা করে নারীকে পাপ-পংকিলতা ও অপবিত্রতার উৎস এবং অকল্যান ও বালা-মুসিবতের মূল মনে করে। অথচ নারী সৃষ্টি ও স্বভাবের দিক থেকে প্রথম প্রাণী - যাকে আল্লাহতায়ালা আদমের স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ বিস্তার করেছেন। সুতরাং মূল জন্মগত অভ্যাসের দিক থেকে নারী পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বরং পার্থক্য হচ্ছে তাদের প্রকৃতি এবং কর্মের দিক থেকে।

মানব জাতি এর মাঝে দীর্ঘদিন ধরে হাবুডুবু খেয়েছে। এজন্যই ভিত্তিহীন চিন্তা-চেতনা প্রভাবে দীর্ঘকাল যাবত তারা নারী সমাজকে মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। অতঃপর যখন তারা এ মারাত্নক ভুল শোধরাতে চেষ্টা করলো তখন আরেকটি ভয়াবহ ভুল তারা করল। একটি কথা তারা ভুলে গেলো যে, সে আসলেই মানুষ, আর মানুষের কল্যানেরই তার সৃষ্টি। এখানে এক অংগ অন্য অংগের পরিপূরক। দায়-দায়িত্বের দিক থেকে তারা সমকক্ষ দুই ব্যক্তি নয়, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক, স্বামী-স্ত্রী। দীর্ঘ গোমরাহীর পর মানুষ এ বাস্তব সত্যের দিকে এখন ধীরে ধীরে ধাবিত হচ্ছে।

৪। এই আয়াতটি আরো নির্দেশ করে যে, মানব জীবনের ভিত্তি হচ্ছে পরিবার, সুতরাং পরিবারের এ চারাগাছের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা পৃথিবী শুরু করার সংকল্প করলেন। প্রথমে একটি প্রাণ সৃষ্টি করে তার থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করলেন। অতঃপর স্বামী স্ত্রীর একটি পরিবার গঠিত হলো। তারপর আল্লাহতায়ালা এ উভয় থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ বিস্তার করলেন। যদি আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা পোষন করতেন তাহলে প্রথমেই অসংখ্য নারী-পুরুষ ও তাদের সাথীদের সৃষ্টি করতে পারতেন। ফলে প্রথম বারেই অগনিত পরিবার হয়ে যেতো। তখন প্রগাঢ় বন্ধন ব্যতিরেকে আত্নীয়তার কোন বন্ধন তাদের মাঝে থাকতোনা। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইলেন, তাই তিনি প্রভূত্বের বন্ধন

থেকে শুরু করলেন, যা হলো মূলতঃ সকল বন্ধনের মুল। আত্নীয়তার বন্ধনকে আল্লাহতায়ালা আনলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে। সুতরাং গঠিত হলো এ নর-নারীর প্রথম পরিবার যারা এক প্রাণ, এক স্বভাব এবং এক সৃষ্টি থেকে দুনিয়াতে এলো। আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে বিস্তার করেন। সকলেই প্রথমে প্রভূত্বের বন্ধন তারপর পারিবারিক বন্ধনের উপর আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানব সমাজে বিধান প্রতিষ্ঠিত হলো।

ইসলামী বিধানে পরিবারের হেফাযত, তার বন্ধন প্রসার করা ও ভিত্তি মযবুত করার সাথে পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করতে পারে এ জাতীয় সকল উপায় উপকরণ থেকে পরিবারকে হেফাযত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই উপায় উপকরণের প্রথম দিকে রয়েছে নারী এবং পুরুষের ভূমিকাসমূহ ভুলে যাওয়া এবং উভয়ের ভূমিকায় সমন্বয় সাধন করে পরিবার গঠনে উভয়ের ভূমিকায় একে অপরের পরিপূরক এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া।
এই সূরা সহ অন্যান্য সূরায় ইসলামী বিধান পরিবারের গুরুত্বের বৈশিষ্ট্য সমূহের সমাহার ঘটেছে। জাহেলী সমাজের যে দৃষ্টিকোন থেকে নারীদের দেখা হয়। আর যে বৈষম্যের আচরণ তাদের সাথে করা হয় সে পরিস্থিতিতে পরিবারের কোন শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সম্ভব নয়। একমাত্র ইসলামই জাহেলী সমাজের হীন দৃষ্টিকোন এবং বৈষম্য আচরণের অবসান ঘটিয়ে আদল ও ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিকোন প্রতিষ্ঠা করেছে।

৫। সর্বশেষ সত্য বিষয়টি হচেছ এই যে, মানবজাতি এক প্রাণ ও এক পরিবার থেকে সারা বিশ্বে ক্রমানন্বয়ে বিস্তার লাভ করেছে। তার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার মাঝে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি সে জাতির ইতিহাসে দুটি ব্যক্তি কোথাও এমন পাওয়া যাবেনা যে, যাদের মধ্যে সার্বিক দিক দিয়ে একে অপরের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। আকৃতি ও গুনাবলীতে পার্থক্য । স্বভাব, রুচি, চরিত্র ও অনুভুতির পার্থক্য, কাজের ধরনের পার্থক্য। অসংখ্য জনতার সমাহার থেকে এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সমাধানকারী আল্লাহর এক নযিরবিহীন ক্ষমতার দিকে ইংগিত প্রদান করে এবং তা মানুষের অন্তর এবং চোখকে জীবন্ত প্রানবন্ত এক জাদুঘরে বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দেয়। তাদের অন্তর ও চোখ মানব সমাজের নানাবিধ দৃষ্টান্ত ভাবতে থাকে। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ ধরনের উদাহারণ পেশ করতে সক্ষম নয়। তার ইচ্ছার কোন অসংখ্য রকমারিত্ব ও পার্থক্য করণে সক্ষম। মানুষকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাই এখানে উচুঁ থেকে উচ্চতর আসনে আরোহনের একটা উপায়।
এই আয়াতের শেষের দিকে মানুষকে আল্লাহভীতি অর্জন করার জন্য নির্দেশ করা হচ্ছে। যার নামে তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে স্বীয় হক দাবী করে থাকে আত্নীয়তার হক বিনষ্ট করা থেকেও তাকে ভয় করতে বলা হয়েছে যে, আত্নীয়তার বন্ধনেই গোটা মানবজাতি আবদ্ধ। এরশাদ হচ্ছে.....
"আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক দাবী করে থাকো, আত্নীয় সূত্র ও নিকটাত্নীয়ের সম্পর্ক বিনষ্ট থেকে বিরত থাকো।"
হে মানুষ তোমরা আলণ্ঢাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা পরস্পরের সাথে চুক্তি ও সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে থাকো এবং তা পূরনের জন্যে একে অপরকে তার নামে দোহাই দিয়ে থাকো এবং তোমরা তারই নামে একে অপরকে কসম খাইয়ে থাকো । তোমরা তোমাদের পারস্পারিক সম্পর্ক ও আচার - আচরণের ক্ষেত্রে তাকে ভয় করো।"

আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত হওয়ার কারণে 'তাকওয়া' এর পরিভাষাটি সহজেই বোধগম্য এবং অতি পরিচিত। কিন্তু আত্নীয়তার সম্পর্কের ভীতি একটি নতুন পরিভাষা। যা অন্তরে তার অনুভব্য ছায়া সমূহ মাত্র নিক্ষেপ করে। অতঃপর মানুষ এমন কোন বস্তু পায়না যার দ্বারা সে ঐ বিষয় সমূহের ব্যাখ্যা করতে পারে। তোমরা আত্নীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করতে এবং তাতে ফাটল সৃষ্টি হয় এমন সব বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার জন্য তোমরা তোমাদের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ কর। আত্নীয় স্বজনকে কষ্ট দেয়া এবং রাগান্বিত করা থেকে বিরত থাকো। আত্নীয়দের মাঝে পারস্পারিক সম্প্রীতি, সম্মান, ভালোবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব বজায় রাখতে তোমরা সকলেই সচেষ্ট হও।
অত্র আয়াতের শেষাংশে এসে আল্লাহর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার রক্ষণাবেক্ষন ও তার প্রতি সচেতনতার কথা বলা হয়েছে।
"নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।"
আল্লাহর কড়া দৃষ্টি, সচেতনতা ও খবরদারী কতোইনা ভীতিকর। একমাত্র আল্লাহতায়ালাই সচেতন, খবরদার ও কড়াদৃষ্টি নিবদ্ধকারী সত্তা। তিনিই হচ্ছেন প্রতিপালক স্রষ্টা। তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সব বিষয়ের খবর রাখেন, তার কাছে গোপনে যা কিছুই করে এমনকি মানুষের অন্তরে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন।
* অতএব আমরা আল্লাহভীতি এবং পারস্পরিক একাত্ন সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের পারিবারিক সামাজিক সম্পর্ক সুসংগঠিত ও সুসংহত করব। সাথে সাথে আমাদের আত্নীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় ও সুসংহত রাখব। আল্লাহ আমাদের সবকিছু জানেন এবং পর্যবেক্ষন করছেন এই অনুভূতির মাধ্যমে পারস্পরিক অধিকার যথাযথ ভাবে আদায় করব।
এর মাধ্যমেই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও একাত্নতা সৃষ্টি হবে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

আল্লাহ চাইলেই তোমাদের স্থলে অন্য কাউকে বসাতে পারেন।

إن يشأ يذهبكم ايها الناس ويئات باخرين- وكان الله على ذالك قديرا- (النساء-১৩৩)

হে মানুষ, তিনি (আল্লাহ) চাইলে যে কোন সময় (যমীনের কর্তৃত্ব থেকে) তোমাদের অপসারন করে অন্য কোন সম্প্রদায়কে এনে বসিয়ে দিতে পারেন। এই কাজে তিনি অবশ্যই ক্ষমতাবান।
- (সূরা নিসা-৪, আয়াত-১৩৩)

<u>শানে নুযুল (নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট ও সময় কাল)ঃ-</u>
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

<u>আলোচ্য আয়াতের পটভূমিঃ-</u>

এই সূরার শানে নুযুলের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি এই সূরা ইসলামের পারিবারিক সামাজিক ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্ড়ারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আয়াতের পূর্বের কয়েকটি আয়াতে এতিমের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক করার পর সামাজিক মূল ভিত্তি পারিবারিক সম্পর্ক তথা স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও সম্পর্কের ব্যাপারে বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে আইন সংক্রান্ড় নির্দেশাবলী বিবৃত করার পর এবং বিশেষভাবে মানুষ যেসব তামুদ্দুনিক ও সামাজিক ব্যাপারে অধিকার জুলুম করে থাকে, সেগুলোর সংশোধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করার পর আল্লাহতায়ালা এই ধরনের কয়েকটি অত্যন্ত আবেদনমূলক বাক্যের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ বাণী পেশ করেন। জনগনকে সংশ্লিষ্ট আইন- কানুন পুরাপুরি পালন করে চলতে প্রস্তুত করাই এর উদ্দেশ্য। উপরে যেহেতু ইয়াতিম শিশু ও স্ত্রী লোকদের প্রতি ইনসাফ ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এজন্য এর সংগে সংগেই ঈমানদার লোকদের মনে কয়েকটি উপদেশ মূলক কথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ এই যে, কারো ভাগ্যে ভালো বা মন্দ করে দেয়ার ব্যাপারে তোমার কোন হাত আছে এবং তোমার অনুগ্রহের হাত তার দিক হতে প্রত্যাহৃত হলে তার আর কোন আশ্রয় থাকবেনা, এরূপ ভুল ধারনায় কারো ডুবে থাকা উচিত নয়। কেননা এটা মোটেই সত্য কথা নয় ; সত্য কথা এই যে, তোমাদের সকলেরই ভাগ্যের প্রকৃত মালিক আল্লাহ আর তার কোন বান্দাহকে সাহায্য করার মাধ্যম একা তুমিই নও। যমীন ও আসমান সমূহের মালিকের অসংখ্য মাধ্যম ও উপায় বিদ্যমান এবং তাহা কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তাও তার কিছুমাত্র অজানা নয়।
দ্বিতীয়তঃ তোমাদের ন্যায় পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর উম্মতদিগকে সব সময় আল্লাহকে ভয় করে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ পালন করলে তোমাদেরই কল্যান হবে। তাতে মহান আল্লাহর কোন স্বার্থ বা কল্যান নেই। আর তোমরা যদি এর বির"দ্ধাচারণ কর তবে পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারে নাই, তেমনি তোমরাও কিছুই ক্ষতি করতে পারবেনা। এই বিশ্ব ভূবনের একচ্ছত্র অধিপতি পূর্বেও কারো পরোয়া করেন নাই, আর এখনো তিনি তোমদের কোন পরোয়া করেন না। তোমরা তার শ্বাশত বিধান অমান্য করলে তোমাদেরকে অপসারিত করে তদস্থলে তিনি অন্য কোন জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তোমরা অপসৃত হলে মহান আল্লাহর সম্রাজ্যেরও চাকচিক্য ও রুপ-শোভায় কোন পার্থক্যই সূচিত হবে না।

আলোচ্য আয়াতঃ-

إن يشأ يذهبكم ايها الناس ونأت باخرين- وكان الله على ذالك قديرا- (النساء-১৩৩)

"হে মানুষ, তিনি (আল্লাহ) চাইলে যে কোন সময় (যমীনের কর্তৃত্ব থেকে) তোমাদের অপসারন করে অন্য কোন সম্প্রদায়কে এনে বসিয়ে দিতে পারেন। এই কাজে তিনি অবশ্যই ক্ষমতাবান।

সূরা নিসা-৪, আয়াত-১৩৩

আলোচ্য আয়াতটি বুঝার সুবিধার্থে আরো দু"টি অনুরূপ আয়াত দেখে নেয়া যাক-

(১) هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فانما يبخل عن نفسه- والله الغني و انتم الفقراء- وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم-(محمد-৩৮)

" হ্যাঁ এই হচ্ছে তোমরা! তোমাদেরই তো ডাকা হচ্ছে আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করার জন্যে (অতঃপর) তোমাদের একদল লোক কার্পন্য করতে শুর" করলো। অথচ যারা কার্পন্য করে তারা (প্রকারান্ড়রে) নিজেদের সাথেই কার্পন্য করে। কারন আলণ্ঢাহ তায়ালা তো (এমনিই যাবতীয়) প্রয়োজন মুক্ত, শুধু তোমরাই হচ্ছো অভাবগ্রস্থ। (তা সত্বেও) যদি তোমরা (আলণ্ঢাহর পথে) ফিরে না আসো, তাহলে তিনি তোমদের জায়গায় অন্য (কোন) এক জাতির উত্থান ঘটাবেন, অতঃপর তারা (আর কখনো) তোমাদের মতো হবেনা।
সূরা মুহাম্মদ-৪৭ , আয়াত-৩৮।

(২) والله الغني و انتم الفقراء وإن تتولو يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم (محمد-৩৮)

"(তাদের এ আসার) এ কারনে যে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমান নিয়ে যখনি আল্লাহর কোন রাসুল আসতো তখনি তারা বলতো যে, মানুষই কি (তাহলে) আমাদের পথের সন্ধান দেবে? (এভাবেই) তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং (জেনে বুঝে ঈমানের পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। আল্লাহতায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, (যাবতীয় প্রশংসায়) প্রশংসিত তিনি।
(সূরা আত্ তাগাবুন-৬৪, আয়াত-৬)

আলোচনাঃ
কোরআনের প্রায় জায়গাতেই দেখা যায় নির্দেশনাবলী সম্বলিত আয়াত সমূহের পরপরেই আসে আযাবের আয়াত। বিধি নিষেধ সম্পর্কিত আয়াতের পরই এই ভাবে শাস্তি্র ভয় প্রদর্শন রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা, একমাত্র আলণ্ঢাহর বাদশাহী এ কারনে তার হুকুম না মানলে তিনি অবশ্যই শাস্তি্ দেয়ার অধিকারী অর্থাৎ হুকুম অমান্য ও শাস্তি্ দুটি জিনিসই প্রকৃত পক্ষেই পারস্পারিক সম্পর্ক যুক্ত। অতএব যিনি মালিক, তিনি বাদশাহ বা তার রাজ্যের একমাত্র শাসনকর্তা। আইন রচনা ও পরিচালনার অধিকারও একমাত্র তারই হতে পারে। যার ক্ষমতা তার রাজ্যের সবকিছুর উপর পরিব্যপ্ত এবং আলণ্ঢাহ তায়ালা একাই সবকিছুর মালিক। এই কারনেই তিনিই সকল মানুষের জন্য আইন কানুন তৈরী করার অধিকারী। কাজেই হুকুম দান ও শাস্তি্র ধমক বিষয় দুটি ও পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। এই ভাবে যাদের উপর কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্যই আলণ্ঢাহর চুড়ান্ড় নির্দেশ প্রকাশিত হয়েছে, এসেছে তাকওয়া গ্রহণের হেদায়াত, আর এ কথা এসেছে আসমান সমূহ ও পৃথিবীর মালিককে তা নির্ধারন করার পর, আর কে চুড়ান্ড় নির্দেশ দিতে পারে তা স্থির হয়ে যাওয়ার পর । তাই এরশাদ হচ্ছে-
"আলণ্ঢাহর হাতেই রয়েছে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা, আর তোমদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং বিশেষভাবে তোমাদেরকে আমি চুড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছি আল্লাহকে ভয় কর"
(সূরা নিসা, আয়াত-১৩১)।
সুতরাং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন তিনিই যাকে ভয় করা অন্তরের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আকাংখা জীবন পথের প্রতিটি বাঁকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে।
এই ভাবে আলণ্ঢাহ তায়ালা স্পষ্ট করে তাদের কথাও জানাচ্ছেন যারা আল্লাহর রাজ্যের মধ্যে থেকেও ভুল পথে চলছে তাদের ফয়সালা আল্লাহর হাতে। তিনি তাদেরকে নিয়ে তার রাজ্য চালাতে পারেন এবং তাদেরকে বাদ দিয়েও তার সকল কাজ নির্বাহ করতে পারেন । এরশাদ হচ্ছে-
"যদি তোমরা কুফরী করো তা তোমাদের জানা দরকার যে, অবশ্যই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর এবং আল্লাহতায়ালা চির অভাব মুক্ত, চির প্রশংসিত। আবার বলছি সমস্ড় আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহতায়ালা এবং যাবতীয় কর্ম নির্বাহের জন্য আল্লাহতায়ালা একাই যথেষ্ট।
(সূরা নিসা-আয়াত-১৩২)

"তিনি চাইলে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে দিবেন। হে মানুষ অন্যদেরকে তিনি তোমাদের জায়গায় নিয়ে আসবেন, আর এটা করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।" সূরা নিসা আয়াত-১০৩, সুরা মুহাম্মদ আয়াত-৩৮ এবং সূরা তাগাবুন আয়াত-৬।
আল্লাহতায়ালা সবকিছুর ব্যাপারে মানুষদেরকে তার ভয়কে হৃদয়ে লালন করার জন্য চুড়ান্ড়ভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন। যদি তারা এ কথায় কর্ণপাত না করে এবং কুফরী করে চলে তাহলে তারা না কারও উপকার করতে পারবে, না ক্ষতি করতে পারবে। আলণ্ঢাহর প্রতি তাদের অস্বীকৃতির কারনে তার বাদশাহীতে কোন ক্ষতি হবেনা। এ জন্যে এরশাদ হয়েছে-
"আসমান যমীনে যা কিছু আছে সব তো অবশ্যই আল্লাহর" (৩১-৩২)।

তিনি তাদেরকে অপসারিত করতে যেমন সক্ষম তেমনি তাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে তাদের স্থানে বসাতেও সক্ষম। কাজেই ভালো হওয়ার জন্যই তাদেরকে তিনি তাকওয়া অর্জন করতে বলেছেন এবং তাদের অবস্থা ভালো হওয়ার জন্যই তাকওয়া অপরিহার্য্য। আল্লাহর প্রিয় হওয়া এবং সব দিক দিয়ে ভালো হওয়ার একমাত্র উপায় হলো মানুষ ইসলামের নির্ধারিত আচরন করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সম্মানিত হওয়া। এখন সকল পৃথিবীবাসীর কাছেও সে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তখন গোটা সৃষ্টি তার মূল্যায়ন করতে থাকবে। অপরদিকে তার চিন্তা করা দরকার, মহান আল্লাহকে অস্বীকার করলে, না-ফরমানী, অহংকার প্রদর্শন করলে এবং অযথা সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতার অধিকারী বলে যদি সে নিজেকে মনে করে তাহলে তার পরিনতি কী ভয়ংকর হতে পারে। ইসলামী ধারনার মধ্যে এ কথাগুলো সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে এবং প্রকৃত সত্য এবং বাস্তবতার নিরীখে যাঁচাই করে দেখলে মানুষ এর যথার্থতা অবশ্যই অনুভব করবে।

এখানে যে কথাটি বলা হচ্ছে এবং যে সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, সেটি হলো এই, 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতেন।"----কারণ আল্লাহতায়ালা তার দ্বীনের দাওয়াতের জন্য তোমাদেরকে নির্ধারিত করেছিলেন। এটা তোমদের প্রতি তার পক্ষ থেকে সম্মান ও দান ও অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখন তোমরা যদি নিজেদেরকে এই সম্মান ও অনুগ্রহের উপযুক্ত বলে প্রমান করতে সক্ষম না হও, এই মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনে সক্রিয় না হও এবং তোমদেরকে যে সম্মান দান করা হয়েছে তার যথাযথ মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম না হও তাহলে আল্লাহতায়ালা তোমাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন জাতিকে এই সম্মানের জন্য মনোনীত করবেন। যারা এর মর্যাদা বুঝে ও কদর করে। আলোচ্য আয়াতের এই বক্তব্যে মাঝে এক ধরনের সতর্কবানী লুকিয়ে আছে। এটা কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারে যারা ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন, যারা নিজেদের অন্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে ধারন করে পৃথিবীতে বিচরন করে, যাদের অস্তিত্বে আল্লাহর নূর উদ্ভাসিত হয়ে আছে এবং যারা নিজ প্রভুর দেয়া গুন-বৈশিষ্ট্য ধারন করে চলা ফেরা করে।
যে মানুষ একবার ঈমানের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে, যে মানুষ ঈমানের এই তাৎপর্যকে অন্তরে ধারন করে জীবন পরিচালনা করছে, তার কাছ থেকে যদি এই ঈমানকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাকে যদি আল্লাহর দরবার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, তার মুখের সামনে যদি আল্লাহর সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে তার জন্য জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়বে।
জীবনের আনন্দই সে হারিয়ে ফেলবে। বরং এ জীবন বিশেষ করে তাদের জন্য এক অসহনীয় নরক হয়ে দাড়াবে যারা একবার আল্লাহর নৈকট্য লাভের পর তা বিচ্ছেদের শিকার হয়েছে।

এটা সন্দেহাতীত সত্য যে ঈমান হচ্ছে একটা বড় নেয়ামত। দুনিয়াতে কোনো কিছুই এর সমতুল্য হতে পারে না। অপরদিকে জীবন হচ্ছে খুব তুচছ নগন্য । তেমনিভাবে ধন-সম্পদও হচ্ছে অতি নগন্য ও তুচ্ছ। তাই । ঈমানকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় রাখা হয় অন্য সব কিছু তাহলে ঈমানের পাল্লাটাই ভারী থাকবে।
কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে "তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিস্থাপন করা হবে" এটা একটা গুরুত্বের সতর্কবাণী বটে।
অতএব আমরা আমাদের ব্যক্তি, পরিবার সমাজ অর্থনীতি সকল কাজেই আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান যথাযথ ভাবে অনুসরন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সতর্কবাণীর যথাযথ মূল্যায়ন করব। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে তার সকল হুকুম আহকাম যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন এবং যাবতীয় আজাব ও গজব থেকে হেফাজত করুন। ---------আমীন।